পাঠক রবীন্দ্রনাথ

শিবানী রায়

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুখবন্ধ

প্রায় এক যুগ অর্থাৎ বারো বছরের চেষ্টার ফসল এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থ রচনার একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে যা না লিখলে আমার এই গ্রন্থলেখাই অসম্পূর্ণ বলে মনে হবে। আমি যখন ১৯৭৭ সালে বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রজীবনীকার ঁপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহায়িকা হিসাবে কর্মে নিযুক্ত হলাম, তখন নিজেকে ধন্য মনে করলাম। উনি আমাকে একদিন বললেন, "দেখো বানী, জীবনে অনেক বই-ই তো লিখলাম, কিন্তু একটা বই লেখার ইচ্ছা আমার খুব ছিল, কিন্তু তা আমার দ্বারা আর হল না, সেই কাজটা তুমি কোরো। পাঠক রবীন্দ্রনাথের কথা খুব কম মানুষই জানেন। তিনি যে কত পড়াশোনা করেছিলেন, বিষয়টা জানা দরকার। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তো অনেকেই গবেষণা করেন—তাঁর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি নিয়ে।" কথাটা মনে ধরল। তখন থেকেই অল্প অল্প করে কাজ শুরু করে দিলাম তথ্য সংগ্রহের। ওনার লাইব্রেরিতে ওনার তৈরি কালানুক্রমিক সূচির যে কার্ডবক্সটি ছিল, সেটিই আমাকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, জীবনস্মৃতি, রচনাবলি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাঁরা বই লিখেছেন—তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে সেই সমস্ত বই আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছে।

তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি রবীন্দ্র-ভবনে রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত, রবীন্দ্রনাথ পঠিত এবং মন্তব্য সমন্বিত যে গ্রন্থ-ভাণ্ডার আছে, আমি সেই বই-এর তালিকা এখানে সন্নিবেশিত করিনি। তবে আলোচনা করতে করতে সেই সব বই-এর প্রসঙ্গ কিছু কিছু এসে গেছে। আমি মূলত 'রবীন্দ্র জীবনী'র ৪টি খণ্ডকে অনুসরণ করেই রবীন্দ্রনাথের আশি বছরের জীবনের কালানুক্রমিকতাকে বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি। সন-তারিখের বেশি জটিলতার মধ্যে যাইনি। কারণ এ নিয়ে মতভেদ আছে এবং তা সমাধানের জন্য বহু গবেষকও আছেন।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যাঁর কথা আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে, তিনি হলেন আমার স্বামী ঁঅশোক রায়। তিনিই আমাকে আমার মাস্টারমশাই শ্রদ্ধেয় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি নিয়ে যান। তিনি আমাকে বলে দিয়েছিলেন, কিভাবে বিষয়টিকে বিন্যস্ত করব।

বিভিন্ন ধরনের বই দিয়ে সাহায্য করেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী কবিতা রায়। কবিতা রায়ের সহায়তা আমি বহুভাবেই পেয়েছি, যা এই সামান্য

স্বীকারোক্তিতেই শেষ হবে না। শ্রীযুক্ত বারিদবরণ ঘোষ মহাশয় তাঁর লিখিত একটি প্রবন্ধ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাছাড়া এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে বহুভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন।

বহুদিন ধরে বহু বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে লেখাটা এগিয়েছে। স্থানে স্থানে ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। আরও তথ্য সংগ্রহের ও সংযোজনের অবকাশ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে নিজেই কাজ করে গিয়েছি, সম্পাদনার অভাবে পড়েছিল বহুকাল। সেই কাজটি করে দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রীযুক্ত নিত্যপ্রিয় ঘোষ মহাশয়। আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ) মহাশয়ের সান্নিধ্যে না এলে মনে হয় কোনোদিনই গ্রন্থটি প্রকাশিত হত না। তাঁর স্ত্রী মীরা সরকারের কাছে যে আমি কতভাবে ঋণী, তা লিখে জ্ঞাপন করা যাবে না। আজ যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে তা তাঁদের দুজনেরই অকুণ্ঠ সহায়তায়। মনোলীনা ভট্টাচার্য পাণ্ডুলিপি কপি করে দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে।

সবশেষে বলি 'পুনশ্চ'র প্রকাশক সন্দীপ নায়ককে আমি জেনেছি এই নিখিল-দার মাধ্যমেই। ভ্রাতৃপ্রতিম এই প্রকাশক একের পর এক দুঃসাহসের কাজ করে প্রকাশনীর জগতে বেশ একটি উঁচুদরের স্থান করে নিয়েছে এই অল্পবয়সে। তার প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বইটি প্রকাশের গুরু দায়িত্ব নিয়ে সে শেষ পর্যন্ত বইটি প্রকাশ করে আমার বহুদিনের প্রচেষ্টাকে সফল করল।

শিবানী রায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ জীবনে লিখেছেন অজস্র। পৃথিবীর কোনো কবিই তাঁর স্থান গ্রহণ করতে পারেন নি। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর নাম মুদ্রিত হয়ে থাকবে অনন্তকালের জন্য। যতদিন মানব-জীবনের ধারা প্রবাহিত হবে, ততদিন রচিত হবে ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসও কখনও ভুলে যেতে পারবে না রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ কলোসাসের মতো দাঁড়িয়ে থাকবেন কালকে অতিক্রম করে। সুকুমার সেন বলেছেন—"অতিশায়িত উচ্ছ্বাসের মতো শোনাইলেও একথা বলিব যে, ঋগ্‌বেদের কবিদের কাছে বৃত্রহন্তম ইন্দ্র যেমন প্রতিভাত ছিল, বাঙ্গাঁলা যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ তেমনি—

ন হী নু অস্য প্রতিমানমস্তি
অন্তর্জাতেষু উত যে জনিত্বাঃ।"

"নাই কিছুতেই ইহার সমকক্ষ তাহাদের মধ্যে যাহারা জন্মিয়াছে অথবা জন্মিবে।"

তাঁর জীবৎকালেই তিনি বহুভাবে আলোচিত। আজও আলোচনা চলছে, চলবে। আমরা তাঁর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, কাব্যের সমালোচনা করি, কিন্তু খুব কমই জানি যে, তিনি কত বড়ো পড়ুয়া এবং সমালোচক ছিলেন। একাধারে তিনি যেমন অজস্র লিখেছেন, তেমনি প্রচুর পড়েছেন এবং সমালোচনা করেছেন। সেই সময় যে সমস্ত বই প্রকাশিত হত কোনোটিই প্রায় তাঁর পাঠ থেকে বাদ যেত না। শুধু যে বই পড়তেন তা নয়, বিভিন্ন ধরনের পত্রপত্রিকাও পড়তেন। কি ইংরাজি, কি বাংলা সমস্তরকম বই পাঠেই ছিল তাঁর সমান উৎসাহ। বিজ্ঞান বিষয়ক বই, হোমিওপ্যাথি ও ডাক্তারিশাস্ত্রের বই পড়তেন আগ্রহ সহকারে। বিশ্বভারতী লাইব্রেরিতে যে কোনো নতুন বই কেনা হলে তাঁর পড়া হয়ে যাবার পর তা লাইব্রেরিতে আসত। রবীন্দ্রনাথের অধ্যয়নশীলতা সম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "তাঁকে সবাই কবি বলেই জানে। তিনি যে কিরূপ পণ্ডিত ও কতরকমের বই পড়েছিলেন তা লোকে জানে না। তাঁর কবিত্ব-খ্যাতি না থাকলে পাণ্ডিত্য-খ্যাতি রটত'।

জীবনে বহু মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন চিঠিপত্রের মাধ্যমে। সেই সমস্ত পত্রালাপের মধ্যেই ধরা পড়েছে তাঁর বিপুল পাঠস্পৃহা। কবি জীবনে তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে বহু চিঠি লিখেছিলেন। কত যে অজস্র বিচিত্র ধরনের বই পড়েছেন তা তাঁর চিঠিগুলি পর্যালোচনা করলেই জানা যাবে। প্রিয়নাথ সেন ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। কবির সঙ্গে তাঁর যে পত্র বিনিময় হয় তাতে বহু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাবে। কবি অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন কবির সহায়ক।

তাঁর সঙ্গে কবির যে যোগাযোগ ছিল তাতে রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীর বহু গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী কবির আত্মীয় ছিলেন। আত্মীয়তা অপেক্ষা বন্ধুত্বই ছিল বেশি। সবুজপত্রের মাধ্যমে সেই যোগাযোগ রক্ষিত হত।

কোনো কোনো কবি বা লেখক রবীন্দ্রনাথকে বলতেন তাঁর বই-এর ভূমিকা লিখে দিতে, কবি সানন্দেই তা দিতেন। তিনি শুধু পাঠক এবং সমালোচকই ছিলেন না, অনুবাদকও ছিলেন। 'কড়ি ও কোমলে'র বহু কবিতা ইংরাজির অনুবাদ। সেই সমস্ত ইংরেজ কবিদের মধ্যে আছেন—ভিক্টর হুগো, শেলি, ব্লেক ব্রাউনিং, দান্তে, পেত্রার্কাও এ থেকে বাদ যান নি। সংস্কৃত বা পালি সাহিত্যের প্রতি কম অনুরাগ ছিল না। 'রূপান্তর' নামক বইটিতে সংস্কৃত এবং পালির বহু অনুবাদ আছে।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন খুঁজে বেড়াত অজানাকে। এদিক থেকে তিনি কবি হয়েও বিজ্ঞানী। ভাবতে অবাক লাগে যে, অণুপরমাণু, নীহারিকা জগৎও তাঁর অজানা ছিল না। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর অসীম কৌতূহল। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছোটোবেলা থেকেই এই শিশু পুত্রটির অন্তরে বিজ্ঞানের বীজটিকে রোপণ করেছিলেন। ডালহৌসি পাহাড়ে থাকাকালীন দেবেন্দ্রনাথ বালক পুত্রকে গ্রহনক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, কক্ষচক্রের দূরত্ব, মাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় ইত্যাদির কথা শোনাতেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কবি নিজেই বলেছেন, "বিশ্বপরিচয়" নামক গ্রন্থে। "জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বিষয়ের বই তখন কম বের হয়নি। স্যার রবার্ট বল-এর বড়ো বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকোম্বস, ফ্লাঁমবিয়ঁ প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি। গলাধঃকরণ করেছি শাঁসসুদ্ধু বীজসুদ্ধু। তারপর একসময়ে সাহস করে ধরেছিলুম প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে হাক্সলির একসেট প্রবন্ধমালা"।

তিনি যে পড়তেন এবং সমসাময়িক লেখকরা তাঁর মতামতের অপেক্ষায় থাকতেন তা তাঁর লিখিত চিঠি থেকেই জানতে পারছি। তিনি এক চিঠিতে লিখছেন—"সামনে স্তূপাকার আধুনিক বাংলা গল্পের বই আমার অভিমতের অপেক্ষায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। নীরবেই তাদের সৎকার হবে—আমার শক্তি নেই। লেখকরা মনে করে আমি তাদের প্রতি উদাসীন। একথা ভাবে না তারা প্রত্যেকে একজন, কিন্তু আমার ঘরে তারা অসংখ্য—তাছাড়া আমার সময় নিরবধি নয়, আমার শক্তি পরিমিত।"

পুত্র রথীন্দ্রনাথ "পিতৃস্মৃতি"তে পিতার পড়ুয়া প্রকৃতির কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "একরাশ বই তাঁর নিত্য সহচর। যেখানেই যেতেন একটি ছোটখাটো লাইব্রেরি সঙ্গে যেত। তার মধ্যে থাকত গ্যেটে, তুর্গেনিভ, বালজাক, মোপাঁসা, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্য, অমরকোষ ও কয়েকখানা সংস্কৃত বই। সাহিত্য ছাড়াও তিনি ভালবাসতেন পড়তে জ্যোতির্বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি দুর্বোধ্য বিষয়ের মোটা মোটা বই"।

'জল পড়ে পাতা নড়ে' —আদি কবির এই কবিতা দিয়ে কবির পাঠ জীবনের শুরু। যদিও এই কথা 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন তবুও একথা সমর্থন না করে বলতে হয়, কবির জীবনের পাঠ শুরু হয়েছিল মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত 'শিশু শিক্ষা' দিয়ে। পাঠ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্না জুড়ে দিলেন বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য। গুরুমহাশয় বললেন—"এখন স্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে"। গুরুমহাশয়ের এই ভবিষদ্‌বাণী যে কতটা সত্য হয়েছিল তা রবীন্দ্রপাঠক মাত্রেই জানেন। এরপর যে বইটি পাঠের কথা আসে সেটি হল শুভঙ্কর দাস পণ্ডিতের শিশুবোধ। প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন, "গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে অ, আ, ক, খ শেখার অল্প পরেই রবীন্দ্রনাথ এই সচিত্র 'শিশুবোধক' পড়েছিলেন।" পরে তিনি আরও মন্তব্য করেন, ".....এই শিশুবোধকেই পেয়েছিলেন মূলপাঠসহ চাণক্যশ্লোকের বাংলা পদ্যানুবাদ"। প্রবোধবাবুর এই মন্তব্যের উল্লেখ করতে হল এই কারণে যে, কবি নিজেই চাণক্যশ্লোকের উল্লেখ করেন 'জীবন-স্মৃতিতে', বলেছেন, ".....আর মনে পড়ছে কিছু কিছু চাণক্যশ্লোক।"

স্কুলের সময় ছাড়া বাকি সময় কাটত ভৃত্যদের মহলে। সেই ভৃত্যদের মধ্যে গুরুমহাশয় ছিলেন ঈশ্বর। নিতান্ত ছেলেবেলা থেকে বই পড়া কী সূত্রে শুরু হয়েছিল তা বলতে গিয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, "চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়া আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাসের রামায়ণই প্রধান। সেই রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। "সেদিন মেঘলা করিয়াছে। দিদিমা যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্ব্বেল কাগজমণ্ডিত কোন ছেঁড়া মলাটওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম"। এরই মধ্যে যে সমস্ত বই কবির মনে রেখাপাত করেছিল সে সমস্ত বইগুলো হল—কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি (হিন্দী বেতাল পৈচীসী), ডেনিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুশো, নীলমণি বসাক কর্তৃক অনূদিত আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের সুশীলার উপাখ্যান, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত মৎস্যনারীর কথা, উমাচরণ মিত্র কর্তৃক অনূদিত গোলেবকাওলি, হরিনাথ মজুমদারের বিজয় বসন্ত, হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। এছাড়াও পড়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বোধোদয়', 'সীতার বনবাস', অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ', 'পদার্থবিদ্যা', রামগতি ন্যায়রত্নের 'বস্তুবিচার', সাতকড়ি দত্তের 'প্রাণিবৃত্তান্ত', মধুসূদন বাচস্পতির 'ছন্দোমালা', লোহারাম শিরোরত্নের 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'।

কিন্তু বাঁধাগত বই পাঠেই কবির মন তৃপ্ত হত না। হাতের কাছে যা বই-ই পেতেন, তাই-ই পড়তেন। কবি নিজেই সে সম্পর্কে বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যে যে কোন বই

বাহির হইলে আমার লুব্ধ হস্ত এড়াইতে পারিত না। ....এই সমস্ত বই পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণত হইয়াছিল বাংলা গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি''। এই সময় তিনি 'মেঘনাদবধ' কাব্য পাঠ করে বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। পরে সেই কাব্যের এক কঠিন কঠোর সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন 'ভারতী' পত্রিকাতে —''আমি মেঘনাদ বধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না—আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম তাহা মহাকাব্যই নয়।

হে মহাকবিগণ লড়াই বর্ণনা তোমাদের ভাল আসিবে না, লড়াই বর্ণনায় তোমার প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙ্গালীদের মনুষ্য হইতে শিখাও।''

আর রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব তাঁর পরবর্তী জীবনের বহু লেখার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই অংশে সেই প্রভাবের কথা কিছু আলোচনা করব। কিছু বলছি এই কারণে যে, রবীন্দ্রজীবনে রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব নিয়ে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করার সুযোগ আছে। প্রথমে বলা যেতে পারে কবি-কাহিনীতে কবি বাল্মীকিকে স্মরণ করেছেন।

''মিলি তার সাথে
জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ভারতী,
কাঁদিলেন আর্দ্র হয়ে পৃথিবীর দুঃখে,
ব্যাধ শরে নিপাতিত পাখীর মরণে
বাল্মীকির সাথে যিনি করেন রোদন।''

'বাল্মীকি প্রতিভা'য় ক্রৌঞ্চযুগলের করুণ কাহিনীকে অবলম্বন করেছেন। 'কাহিনী' কাব্যের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি রামায়ণ রচনার পশ্চাদপট হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যের ৬৩-৬৪ সংখ্যক সর্গ, মানসী কাব্যের 'অহল্যার প্রতি', 'সোনার তরী' কাব্যের 'পুরস্কার', চিত্রা কাব্যের 'নগরসংগীত' প্রভৃতি কবিতা ব্যাসকাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

শুধু কাব্য কেন বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যেও রামায়ণের আলোচনা করেছেন। 'অপূর্ব রামায়ণ' প্রবন্ধে রামকথার এক অভিনব ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ক্ষিতি বলেছে— ''রাজা রামচন্দ্র অর্থাৎ মানুষ—প্রেম নামক সীতাকে রাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আনিয়া নিজের অযোধ্যাপুরীতে পরমসুখে বাস করিতেছিলেন। এমন সময় কতকগুলি ধর্মশাস্ত্র দল বাঁধিয়া এই প্রেমের নামে কলঙ্ক রচনা করিয়াছিল''।

এখানে কবি রামায়ণকে একরকমভাবে রূপক হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন। আবার, 'রক্তকরবী'তে রামায়ণের আর এক রূপক। কবি নিজেই তাঁর নাটকের রূপক রূপ আলোচনা করে বলেছেন, ''কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে.....। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে

নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তাছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। ..... নবদুর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল, সেটা কি সেকালের কথা না একালের সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা, তখনো কি সোনার খনির মালিকরা নবদুর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধরে টান দিয়েছিল"?

এ তো গেল মালিক শ্রেণী আর শোষিত শ্রেণীর কথা। রাম আর রাবণের অর্থ বিশ্লেষণ করে লিখলেন, "হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হলো আরাম, শান্তি। রাবণ হোল চিৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর; আর একটিতে শান বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। তৎ সত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপক নাট্য নয়"।

শুধু কাব্য কেন অন্যান্য রচনার মধ্যে রামায়ণের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। পরিচয় গ্রন্থে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রামায়ণকে কৃষি সভ্যতার বিস্তারের রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

কবির ঐ বয়সে প্রকাশিত হত 'অবোধবন্ধু পত্রিকা'। জ্যোতিদাদার আলমারিতে থাকত ওই পত্রিকাটি। কবি কিছুতেই ওই পত্রিকাটি পাঠের লোভ সামলাতে পারলেন না। এই পত্রিকায় কবির সঙ্গে পরিচয় ঘটল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর। বিহারীলালের প্রকৃতিপ্রেম কবিকে মুগ্ধ করল। তাঁর কাব্য পাঠ করে কবির মন হু হু করে উঠত। এই অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত হয়েছিল বিহারীলালের 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'বঙ্গসুন্দরী', 'সুরবালা', 'সারদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্য। কবি এই সমস্ত কাব্য পাঠ করে তার সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন 'সাধনা' পত্রিকায় (১৩০১)। 'বঙ্গসুন্দরী' সম্পর্কে কবির অভিমত, "এই বর্ণনাগুলি কতবার পাঠ করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই এবং এই সমস্ত শ্লোকের মধ্য দিয়া সমুদ্র পর্বত অরণ্যের আহ্বান বালক পাঠকের অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল"। 'সারদামঙ্গল' সম্পর্কে লিখলেন, "সারদামঙ্গল এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম, তাহার ভাষায়, ভাবে এবং সংগীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম। অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয় এই বুঝি কাব্যের মর্ম পাইলাম অমনি তাহা আকার পরিবর্তন করে সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়। কিন্তু রূপকে স্থায়ী ভাবে ধারণ করিয়া রাখে না।"।

এই অবোধবন্ধু পত্রিকাতেই পড়লেন 'পৌলবর্জিনীর' অনুবাদ। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়—Jacques Henri Bernardin a Saint Piert (1734-1824) রচিত Paul et Virginis—নামক ফরাসী উপন্যাসটি অনুবাদ করেন।